জলাভূমি প্রকৃতির কিডনি।
জলাভূমিকে প্রকৃতিকে দূষণ মুক্ত ও নির্মল রাখে।
জলাভূমি ভরাট করা অপরাধ।
জলাভূমি সংরক্ষণ করা প্রতিটি মানুষের নৈতিক দায়িত্ব।

বিজ্ঞান অন্বেষক

গ্রাহক মূল্য
বার্ষিক ১৫ টাকা, যোগাযোগ ঃ বিজ্ঞান অন্বেষক, প্রযত্নে : বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড, (বিনোদনগর)
পোঃ কাঁচরাপাড়া-৭৪৩১৪৫
জেলা ঃ উত্তর ২৪ পরগণা।

বর্ষ-৯ সংখ্যা - ২ মে - জুন / ২০১২ RNI No. WBBEN/03/11192 মূল্য ১

সূর্যের বুকে গতিশীল শুক্রকে দেখুন

২০১২ এর ৬ই জুন। এক বিরল মহাজাগতিক ঘটনারসাক্ষী হতে চলেছি আমরা। ঐ দিন একটা ছোট্ট কালো গোল চাকতি সূর্যের আলোকিত চাকতির একপাশ থেকে অন্য পাশে চলে যাবে ধীরে ধীরে। ঐ কালো গোল চাকতিটি পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের গ্রহ শুক্র। ঘটনাটিকে বলা হবে 'সূর্যের উপর শুক্রের অতিক্রম বা সরণ'। এর আগে এই ঘটনা ঘটেছিল ২০০৪ সালের ৮ জুন তারিখে। তার আগে এই ঘটনা ঘটেছিল ১৮৮২ সালের ৬ ডিসেম্বর তারিখে। এই ২০০৪ এবং ১৮৮২ সালের ঘটনা দুটির ব্যবধান ১২১.৫ বছর। আগামী জুনে সূর্যের উপর শুক্রের সরণ-এর ঘটনা আমরা সকলেই দেখব। দেখব সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে, চোখের উপযুক্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে।

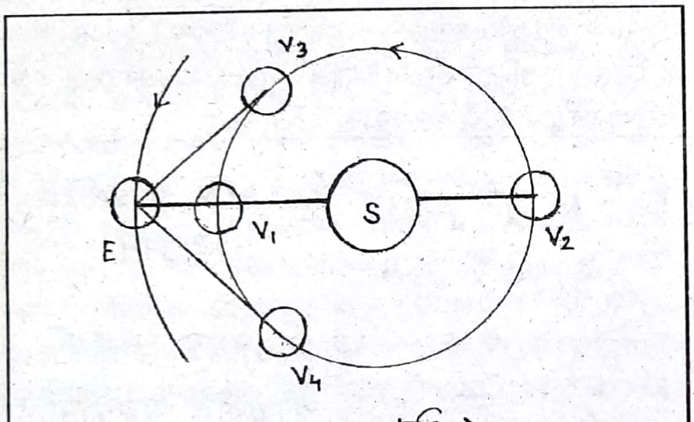

ছবি-১

সূর্য থেকে শুক্র দ্বিতীয় গ্রহ। বুধ ও শুক্র গ্রহ দুটো সূর্য ও পৃথিবীর কক্ষপথের মাঝে থাকায়

এরপর 2 পাতায়

জল সমস্যা ও ভবিষ্যৎ

সভ্যতার ক্রমবিবর্তন থেকে মানব জাতির অগ্রগতি... সবেতেই জল অনস্বীকার্য। জলকে পবিত্র জ্ঞান করে হিন্দু, খ্রিষ্টান, ইসলাম, জুডাইসিস, শিন্টো প্রভৃতি ধর্মের মানুষেরা। আমরা জানি যে সমগ্র পৃথিবীর মোট আয়তনের ৭০ শতাংশ জলভাগ। কিন্তু আশ্চর্যের এই যে, তার মাত্র ১ শতাংশ জল পানযোগ্য। কারণ প্রাপ্ত জলের অধিকাংশই হয় সমুদ্রের নোনোজল রূপ, হিমবাহ অবস্থানে অথবা ভূগর্ভের ভান্ডারে সঞ্চিত আছে। অর্থাৎ এটা ভীষণ পরিষ্কার ভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে, আপাতভাবে জল ভান্ডার অফুরন্ত মনে হলেও আসলে তা সীমিত।

জলের অপর নাম জীবন। তাই যদি জল আক্রান্ত হয় তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবেই জীবনও আক্রান্ত হয়। আর তা যদি একটি মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে সমগ্র মানবজাতির কিংবা পৃথিবীর জীবন সংকটের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, তাহলে তার গুরুত্ব দাঁড়ায় প্রশ্নাতীত। জল সমস্যার ঘূর্ণাবর্তে পাক খেতে খেতে আমরাও চলেছি এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের গর্ভে, অথচ সেই আমরাই উদাসীন। সীমিত জলভান্ডারকে আমরা নানা ভাবে বিনষ্ট করে চলেছি। আর তার ফলে শুধু খরা প্রবন অঞ্চলেই নয়, অত্যাধিক জলপূর্ণ অঞ্চলেও এখন জলের জন্য মাথা খুঁড়তে

এরপর 3 পাতায়

পিঁপড়ের নানা কথা

যাবে নাকি পিঁপড়ের দেশে? কী হল? ভয় করছে? যদি কামড়ে দেয়? কিন্তু ওদের কথা জানতে হলে ওদের দেশে তো যেতেই হয়।

পিঁপড়ের ভয় পায় না এমন কেউ নেই। সৈন্য সামন্ত নিয়ে এরা যখন পাতালপুড়ী থেকে হাজারে হাজারে লাখে লাখে বেড়িয়ে আসে, তখন বনের জন্তু-জানোয়ার তো বটেই মানুষও ভয়ে দে পিঠ্‌টান। দলবদ্ধ এই ছোট্ট ছোট্ট প্রাণীগুলোর সঙ্গে যুদ্ধে জেতা অসম্ভব।

কত পিঁপড়ে পৃথিবীতে?

বলতে পারো পৃথিবীতে কত পিঁপড়ে আছে? শুনলে তাজ্জব বনে যাবে। বিশেষজ্ঞদের মতে পৃথিবীতে যত পিঁপড়ে আছে তাকে যদি এক জায়গায় জড়ো করে ওজন করা যায় তবে সেই ওজন পৃথিবীতে যত মানুষ আছে তাদের মোট ওজনের থেকে বেশি হবে। জন সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মানুষ আজ নানা সমস্যার সন্মুখীন। পরিবেশ সংকট, খাদ্য সংকট, জল সংকট প্রভৃতি নানা প্রযুক্তির সাহায্যেও পৃথিবীর বুদ্ধিমান জীব এই সমস্যা সমাধানে নাকানি চোবানি খাচ্ছে।

এরপর 6 পাতায়

সূর্যের বুকে গতিশীল

1 পাতার পর

এরা অন্তর্গ্রহ। ১নং ছবিতে সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ও শুক্রের বিশেষ কিছু অবস্থান চিহ্নিত করা হল। যখন শুক্র (V_1), পৃথিবী (E) এবং সূর্য (S) এর ঠিক মাঝখানে রয়েছে। এ অবস্থানে শুক্র অদৃশ্য থাকে কারণ শুক্রের আলোকিত তল সূর্যের দিকে থাকে। শুক্রের এই অবস্থানকে বলে অন্ত সংযোগ। আবার যখন সূর্যের যে দিকে পৃথিবী, শুক্র তার ঠিক বিপরীত দিকে থাকে তখনও শুক্র অদৃশ্য থাকে। কারণ সূর্য শুক্রকে আড়াল করে। শুক্রের এই অবস্থানকে বলে অন্তঃসংযোগ। বহিঃ সংযোগ থেকে অন্তঃসংযোগ পর্যন্ত শুক্রকে সন্ধ্যাতারা হিসাবে সন্ধ্যার আকাশে ও অন্তসংযোগ থেকে বহিঃ সংযোগ পর্যন্ত শুক্রকে শুকতারা হিসাবে ভোরের আকাশে দেখা যায়।

শুক্র ২২৪.৭ দিনে সূর্যকে একবার পরিক্রমা করে। এই সময় কালকে বলে শুক্রের পর্যায়কাল। পৃথিবীর পর্যায়কাল ৩৬৫.৩ দিন। ৫৮৩.৯২ দিন বা প্রায় ১.৬ বছর পরপর সূর্য ও পৃথিবীর ঠিক মাঝখানে শুক্র চলে আসে। এই সময়কালকে বলে শুক্রের যুতিকাল।

প্রতি অন্তঃ সংযোগ পৃথিবী থেকে শুক্রকে সূর্যের বুকে কালো চাকতির মতো দেখতে পাওয়ার কথা। কিন্তু তা হয় না। কেন হয় না? কারণ, শুক্রের কক্ষতল পৃথিবীর কক্ষতলের সঙ্গে ৩ ডিগ্রী ২৩ মিনিট ৪০ সেকেন্ড কোনে নত। ফলে অধিকাংশ অন্তঃসংযোগে সূর্য, শুক্র ও পৃথিবী একই উল্লম্ব তলে অবস্থান করলেও এক সরলরেখায় থাকে না। ২নং ছবিতে অবস্থান। আবার গ্রহ দুটির কক্ষতল যে সরলরেখায় ছেদ করে সেই সরলরেখার একটি বিন্দুতে শুক্র পৃথিবীর কক্ষতল ছেড়ে উত্তর দিকে যায় আর ঠিক বিপরীত বিন্দুতে শুক্র পৃথিবীর কক্ষতল ছেড়ে দক্ষিণ দিকে যায়। প্রথম বিন্দুটিকে বলে উচ্চপাত বিন্দু এবং দ্বিতীয় বিন্দুটিকে বলে নীচপাত বিন্দু। গ্রহটি দক্ষিণ থেকে উত্তরে যাওয়ার সময় যে বিন্দুতে ক্রান্তিবৃত্তকে অতিক্রম করে সেটিই উচ্চপাত বিন্দু এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে যাবার সময় যে বিন্দুতে ক্রান্তিবৃত্তকে অতিক্রম করে সেটিই নীচপাত বিন্দু। শুক্র যখন সূর্য ও পৃথিবীর মাঝে উচ্চপাতবিন্দু বা নীচবাতবিন্দু তে অবস্থান করে অথবা বিন্দু দুটির খুব কাছাকাছি থাকে তখন দিনেরবেলায় সূর্যের বুকে কালো চাকতির মতো শুক্রের অতিক্রমন দেখতে পাওয়া যায়। এই ঘটনাকে বলবো শুক্রের অতিক্রমন'। শুক্রের এমন অবস্থান তথা অতিক্রমনের ঘটনা অত্যন্ত বিরল। সুতরাং দেখা গেল শুক্রের অতিক্রমণের জন্য দুটি শর্ত একসাথে পালিত হওয়া দরকার। (১) শুক্র এবং পৃথিবীর অন্তঃসংযোগ হবে (২) সূর্য, শুক্র ও পৃথিবী একই সরলরেখায় থাকবে। শুক্রের মতো বুধ গ্রহেরও ট্রানজিট হয়। আমরা বুধের ট্রানজিট দেখেছি ২০০৩ সালের ৭ মে তারিখে।

শুক্র পৃথিবীর কক্ষতলের নীচে অবস্থান করে অবস্থানে অন্তঃসংযোগে থাকতে পারে আবার পৃথিবীর কক্ষতলের উপরে অবস্থান করে অন্তঃসংযোগে থাকতে পারে। শুক্র নীচপাতবিন্দু অতিক্রম করে ১০ জুন বা তার দু'একদিন আগে এবং উচ্চপাত বিন্দু অতিক্রম করে ১০ ডিসেম্বর বা তার দু'একদিন আগে। শুক্রের ট্রানজিটের ঘটনা ৮ বছরের ব্যবধানে জোড়ায় ঘটে। দুটি জোড়ার সময়ের ব্যবধান ১২১.৫ বছর বা ১০৫.৫ বছর। নথিভুক্ত তথ্যানুযায়ী ১৬৩১ সালের ৭ ডিসেম্বর, ১৬৩৯ সালের ৪ ডিসেম্বর, ১৭৬১ সালের ৬ জুন, ১৭৬৯ সালের ৩ জুন, ১৮৭৮ সালের ৯ ডিসেম্বর, ১৮৮২ সালের ৬ ডিসেম্বর, ২০০৪ সালের ৮ জুন তারিখগুলিতে শুক্রের ট্রানজিট হয়েছে। অতএব দেখা যাচ্ছে শুক্রের সব ট্রানজিট-ই হয় জুন কিংবা ডিসেম্বরে।

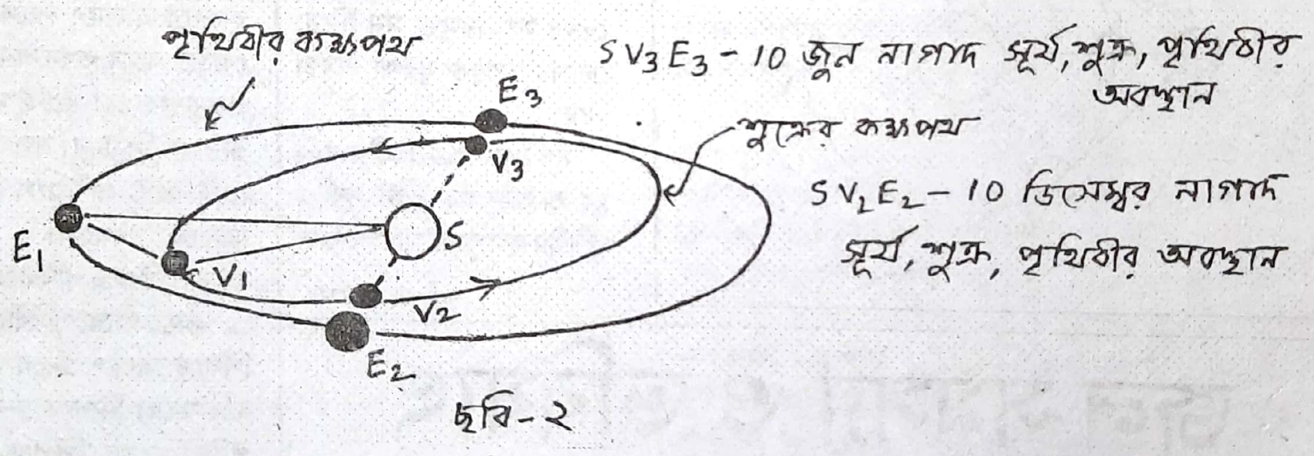

ছবি-২

এবারের ট্রানজিট ঃ ২০১২-র জুনের ট্রানজিট পৃথিবীর প্রায় সমস্ত অঞ্চল থেকেই দেখা যাবে। পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল, পূর্ব এশিয়া, অস্ট্রেলিয়ার পূর্বাংশ, সমগ্র উত্তর ও মধ্য আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরাংশ, ইউরোপ, পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া, পূর্ব আফ্রিকা, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া থেকে দেখা যাবে এবারের ট্রানজিট। ট্রানজিট শুরু হবে আন্তর্জাতিক সময় ০১ : ২৪-এ।

কলকাতা ও তার সন্নিহিত এলাকার সময় ঃ

০৩:১০:৩৬ — শুক্রের কালো চাকতি সূর্যকে স্পর্শ করবে। একে বলে প্রথম স্পর্শ। (ছবি ৩ এর ১)। এর পরেই শুক্রের কিছু অংশ যখন সূর্যের মধ্যে ঢুকবে তখন শুক্রের বায়ুমন্ডলের মধ্য দিয়ে আলোর প্রতিসরণের ফলে শুক্রের চাকতির বাইরে একটি আলোকিত ছোট বৃত্তচাপ

এরপর 5 পাতায়

জল সমস্যা ও ভবিষ্যৎ

1 পাতার পর

হয়। মাত্রাতিরিক্ত জলের ব্যবহার, ভূগর্ভ থেকে ব্যাপক পরিমানে জল উত্তোলন, জল দূষণ, মাটির নীচের জলস্তর কমে যাওয়া, জল সচেতনার অভাব 'জল' কে করে তুলেছে এক 'মহার্ঘ্য' বস্তু। জলকে যেখানে 'লাইফ ব্লাড' বলা হচ্ছে সেখানে জল পাওয়া না গেলে বিশ্বজুড়ে হাহাকার উঠবেই। তাই জলকে রক্ষা করবার জন্য প্রতি বছর ২২ মার্চ দিনটি সমগ্র পৃথিবী জুড়েই 'আন্তর্জাতিক জল দিবস' রূপে পালিত হচ্ছে। ১৯৯২ সালে রিও ডি জেনিরোর বসুন্ধরা সম্মেলনে 'জলদিবস' পালনের প্রেক্ষাপট রচিত হলেও ১৯৯৩ সাল থেকেই ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম প্রতিবছর ২২ মার্চ দিনটি 'আন্তর্জাতিক জলদিবস' রূপে পালিত হয়। অতএব জল মূল্যবান সম্পদ একথা নিয়ে কোন সন্দেহ যেমন নেই, তেমনি জল রক্ষায় এক্ষুনি যে অগ্রণী হতে হবে আমাদের সেটাও সন্দেহাতীত। কিন্তু জলচিত্রে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে ভারতবর্ষ? কিংবা পশ্চিমবঙ্গ? আসুন একটু চোখ বুলিয়ে নিই—

ভারতবর্ষের জলচিত্রঃ

১৯৯৫ সালের হিসাব অনুযায়ী ভারতবর্ষের ১৯টি শহর তখনই জল কষ্টে ভুগছিল আর বিজ্ঞানীদের মতে, ২০০৫ সাল নাগাদ সমগ্র ভারতবর্ষই 'জল অভাবী' অঞ্চলে পরিণত হবে। আর একথা শুনতে অবাক লাগলেও একথা ঠিক যে, ভারতবর্ষের মতো দেশে কৃষি কার্য জল সংকটের জন্য মূল দায়ী। কারণ জল চাহিদার ৮৬ শতাংশই কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হয়। ইউ এন ও-র দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০৫০ সাল নাগাদ ভারতবর্ষের বর্ধিত জনসংখ্যা হবে ১৬ বিলিয়ন। জল সংকট এখনই মাত্রাতিরিক্ত। তাহলে এই বিপুল জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে খাদ্যের প্রয়োজনে কৃষিকার্যের প্রয়োজনে জলের শোচনীয় অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা ভাবলেই গা শিউরে উঠছে। আসলে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে প্রতি বছর মোট পুনরাবর্তন যোগ্য জলের পরিমাণ ১৭০০ কিউবিক মিটার/ক্যাপিটা। তাহলে খুব সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে, সেইদিন আর বেশি দূরে নেই, যখন জলের জন্য মাথা খুঁড়ে মরলেও জল আর পাওয়া যাবে না। সারা পৃথিবী জুড়েই শুরু হবে জলের জন্য হাহাকার।

জলচিত্রে পশ্চিমবঙ্গঃ

গ্রামে প্রতি পাঁচটি পরিবারের একটিতে প্রাত্যহিক পানীয় জল জোগাড় করতে অন্তত আধ কিলোমিটার পথ হাঁটতে হয়।

শহরে প্রতি তিনটি বাড়ির একটিতে জল সরবরাহ নেই।

রাজ্যের ৮১টি ব্লকের ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক এবং ৪৯টি ব্লকের জল ফ্লোরাইডে আক্রান্ত।

পশ্চিমবঙ্গে বছরে বৃষ্টি হয় গড়ে ১৭৬২ মিলিলিটার। বৃষ্টির জলের ২১ শতাংশ মাটির নীচে গিয়ে পুনঃসঞ্চিত হয়। কিন্তু ফি বছর মাটির তলা থেকে তুলে নেওয়া হচ্ছে তার অনেক বেশি জল। ফলে টান পড়ছে ভূ-গর্ভের জল সঞ্চয়ে।

সেচের কাজেই ভূ-গর্ভস্থ জলের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। সরকারি হিসেবে রাজ্যের সেচে ব্যবহৃত শ্যালো, টিউবওয়েলের সংখ্যা ৮ লাখ। বেসরকারি মতে তা আরও বেশি। রাজ্যে ভূ-গর্ভস্থ জলের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি হয় পূর্ব মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলায়।

জল পরিসংখ্যানঃ পৃথিবী - ভারত

পৃথিবীর ১/৬ অংশ জনগন নিরাপদ পানীয় জল থেকে বঞ্চিত। পৃথিবীর ১.৮ বিলিয়ন শিশু প্রতি বছর মারা যায় দূষণমুক্ত জল থেকে ছড়িয়ে পড়া রোগে। (উৎস : ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল)

বর্ধিত জনসংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিতে পরবর্তী ৫০ বছরের জলসম্পদের পুনরাবর্তনের চাহিদা বাড়বে প্রায় ৬ গুণ। পরবর্তী ৫০ বছরে বিশ্বের জনসংখ্যা বাড়বে ৪০-৫০ শতাংশ। (উৎস : ওয়ার্ল্ড ওয়াটার কাউন্সিল)

একজন ইউরোপিয়ান গড়ে ২০০ লিটার জল প্রতিদিন ব্যবহার করে। এখজন উত্তর আমেরিকান সেখানে গড়ে ৪০০ লিটার জল প্রতিদিন ব্যবহার করে। অপরদিকে উন্নয়নশীল দেশের জনগন (যেমন - ভারত) প্রতিদিন গড়ে মাত্র ১০ লিটার জল ব্যবহার করে। (উৎস : ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যানিটেশন কাউন্সিল)

ভারতবর্ষে ৮৬ শতাংশ জল কৃষিকার্যে ৫ শতাংশ শিল্পের কাজে এবং ৭ শতাংশ জল পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

ভারতে এক কিলোগ্রাম আলু চাষ করতে গড়ে ১০০০ লিটার জল প্রয়োজন। একই পরিমাণ গম চাষ করতে জল প্রয়োজন হয় ২৪৫০ লিটার। ধানের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ ৩৪৫০ লিটার।

ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের সমীক্ষা অনুযায়ী ২৭টি এশীয় শহরের তালিকায় প্রতিদিন ঘন্টা হিসাবে নিকৃষ্টতম জল সরবরাহ তালিকায় দিল্লি প্রথম, মুম্বই দ্বিতীয় এবং কলাকাতা চতুর্থ স্থানের অধিকারী। (তথ্যসূত্র : ব্যাকগ্রাউন্ড পেপার ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন নিউ পারস্পেকটিভ অন ওয়াটার ফর আরবান অ্যান্ড রুরাল ইন্ডিয়া ১৮-১৯ সেপ্টেম্বর, নিউদিল্লি)।

সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে এক্ষুনি জল সচেতন না হলে আমাদের ভবিষ্যতই অন্ধকার হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের সচেতনতার নমুনা বলে যে যেটুকু জল আমরা পাই বা পেতে পারি তারও সিংহ ভাগ আমরা দূষিত করে ফেলেছি বা ফেলছি। তাই এবার একটু জেনে নেওয়া ভালো যে জল দূষণ কাকে বলে? কিংবা কী কী কারণে জল ধূষিত হয় আর এর সমাধানই বা কি?

জল দূষণ কী? বা কাকে বলে?

বিজ্ঞানী সাউথউইক ১৯৭৬ সালে তাঁর ইকোলজি অ্যান্ড দ্য কোয়ালিটি অব আওয়ার এনভায়রনমেন্ট গ্রন্থে বলেছেনঃ সাধারণ মানুষের বিভিন্ন ধরণের কাজের ফলে এবং প্রাকৃতিকভাবে জলের ভৌত, রাসায়নিক এবং জৈব উপাদানগুলির গুনমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে জলদূষণ বলে। জলদূষণের এটাই সর্বজনগ্রহ্য সংজ্ঞা।

জলদূষণের কারণঃ

জলদূষণের কারণগুলি নিম্নরূপ

১) ঘরগৃহস্থালীর দৈনন্দিন আবর্জনা জলে দূষণ ছড়ায়, কারণ অনেক দিন ধরে জমা হওয়া আবর্জনা থেকে বিষাক্ত রাসায়নিক ও রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু জলাশয় এবং ভূ-গর্ভস্থ জল উভয়কেই দূষিত করে।

২) শিল্পজাত আবর্জনা ও বর্জ্য পদার্থের দ্বারাও জল দূষিত হয়।

এরপর 4 পাতায়

জল সমস্যা ও ভবিষ্যৎ

3 পাতার পর

কারণ বিভিন্ন কলকারখানা থেকে নির্গত তামা, সিসা, ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়াম, দস্তা, ফসফরাস, ফ্লুরিন ইত্যাদি রাসায়নিক পদার্থ জল দূষণ করে।

৩) কৃষিজাত আবর্জনার ফলে যেমন - অতিরিক্ত সার, কীটনাশক, আগাছানাশক ওষুধ থেকে উৎপন্ন নাইট্রেট, ফসফেট, পটাশ প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ জলে দূষণ সৃষ্টি করে।

৪) বৃষ্টির পর নগর, শহর ও জনবসতি থেকে বের হওয়া ময়লা জলে যেমন নদর্মা, ডাস্টবিন, শ্মশান, খাটাল ইত্যাদি থেকে নির্গত ময়লা জল নদী, জলাশয় এবং ভৌম জলে দূষণ ছড়ায়।

৫) ডিটারজেন্টে নামে একটি রাসায়নিক থাকে যা জলদূষণ ঘটায়।

৬) খনিজ তেল ও খনিজ তেলের উপজাত দ্রব্য সমুদ্রের জলে মিশে দূষণ ঘটায়।

৭) প্রধানত কলকারখানা, যানবাহন ইত্যাদি থেকে ধাতু নিষ্কাশনের ফলে বায়ুমন্ডলে সালফার ও নাইট্রোজেন অক্সাইডগুলি জমা হয়। এই রাসায়নিক পদার্থগুলি ভাসমান জলকণার সঙ্গে বিক্রিয়া করে অ্যাসিড বৃষ্টি ঘটায়, যা জলদূষণ সৃষ্টি করে।

ইউট্রোপিকেসন ঘটিত জলদূষণ

গ্রিক শব্দ 'ইউট্রোফি' থেকে ইংরেজি 'ইউফিকেশন' শব্দটি এসেছে। ইউট্রোফিকেশন হলএকটি পরিপোষক ঘটিত জলদূষণ। পুকুর বা অন্য জলাশয়ের চারপাশ থেকে নানারকম সার বা পুষ্টিকর পদার্থ যেমন ফসফেট ধুয়ে এসে পুকুরের জলে মিশলে সেই জলে শ্যাওলা, কচুরিপানা প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদগুলি খুব তাড়াতাড়ি প্রচুর পরিমাণে বংশবৃদ্ধি করে। এইভাবে প্রাকৃতিক নিয়মে মৃত উদ্ভিদের দেহাবশেষ ক্রমাগত হ্রদ বা পুকুরের নীচে জমা হয় এবং জলাশয়গুলি মজে যেতে থাকে। একে ইউট্রোফিকেশন বলে। ইউট্রোফিকেশনের চরম অবস্থায় জলজ উদ্ভিদের পরিমান খুব বেড়ে গেলে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন-এর সমস্ত অংশ জলজ উদ্ভিদেরা নিজেদের কাজেই ব্যবহার করে। ফলে জলজ প্রাণীগুলি যেমন মাছ, পোকামাকড় ইত্যাদি অক্সিজেনের অভাবে মারা যায়। তাই ইউট্রোপিকেশনকে বলে পরিপোষক ঘটিত জলদূষণ।

গঙ্গা জল দূষণ

গঙ্গার দৈর্ঘ্যে ১৫৬০ মাইল। গঙ্গার দুপাড় জুড়ে বাস করে পাঁচ কোটিরও বেশি মানুষ। গঙ্গা তো ভারতীয়দের জীবনে শুধু নদী নয়, ভারতীয়দের জীবনে, জীবিকায় সংস্কৃতিতে জড়িয়ে থাকা একটি নাম। সাধারণভাবে গঙ্গাকে ঘিরে বিশ্বাস এটাই যে, এই নদীতে স্নান করলে পূণ্য হয়। তা গঙ্গা যতই ময়লায়, আবর্জনায় ভরে থাক না কেন কিছুতেই আমাদের বিশ্বাসের ভিত নষ্ট হতে চায় না। অথচ পরিসংখ্যান বলছে এই নদীরই দুপাশে রয়েছে ২৯টি বড়ো, ৭০টি মাঝারি শহর এবং কয়েক হাজার গ্রাম। প্রতিদিন ১৩ কোটি লিটার নোংরা জল কারখানা থেকে নির্গত হয়ে প্রতিদিন গঙ্গায় এসে মেশে। ৬০ লক্ষ টন রাসায়নিক সার এবং ৯ হাজার টন কীটনাশক জলবাহিত হয়ে প্রতিদিন গ্রামের খেত থেকে এসে গঙ্গায় জলে মেশে। ও স্বীকার করেছে যে, গঙ্গা দূষিত নদীগুলির মধ্যে অন্যতম। রাষ্ট্র এবং বেসরকারি সংগঠন, এনজিও কিংবা একযোগে গঙ্গাকে বাঁচানোর কাজে নামতে হবে। তা না হলে আমাদের 'জীবনরেখা'-ই একদিন স্তিমিত হয়ে যাবে।

বোতলে জল দূষণ

আমরা যে সমস্ত পেট বোতল ব্যবহার করি, জলের জন্য তাও ভীষণ ক্ষতিকর। কারণ পেট বোতলগুলি থেকে অ্যাসিটিলডিহাইড নির্গত করে। এই অ্যাসিটিলডিহাইড প্রকৃতিগত ভাবে 'হাইড্রোপিলিক'। আর এর ফলে সেই জল ক্রমাগত পান করলে আমাদের চোখ জ্বালা, চর্মরোগ, শ্বসনযন্ত্রের সমস্যা, টিউমার ইত্যাদি সৃষ্টি হতে পারে। অতএব আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

জলে ক্লোরাইড দূষণ

ফ্লোরাইডযুক্ত ফ্লুরিন এর লবন প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় নয়, যৌগ হিসেবে পাওয়া যায়। ভূগর্ভস্থ জল এর উৎস। দাঁত ও হাড়ের গঠনের জন্য সামান্য পরিমাণে ফ্লোরাইড প্রয়োজন। কিন্তু তার পরিমাণ একটু বেশি হলেই নানান রকম রোগ দেখা যায়। যেমন— বমি, পেটব্যথা, হজমের সমস্যা, দাঁতের ক্ষয়রোগ, হাড়ের বিকৃতি ইত্যাদি।

ইউনিসেফ এবং ফ্লুরোসিস রিসার্চ অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, দিল্লির রিপোর্ট অনুযায়ী সমগ্র দেশের ১৫টি রাজ্য প্রায় ৩০ মিলিয়ন মানুষ (তার মধ্যে ১৫ মিলিয়ন শিশু) দাঁত, হাড় ও অন্যান্য স্বাস্থ্যজনিত সমস্যায় ভুগছেন।

পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দক্ষিণ দিনাজপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মেদিনীপুর, বর্ধমান ও মালদা প্রভৃতি জেলাগুলি ফ্লোরাইডের সমস্যায় আক্রান্ত।

জল দূষণের ফলাফল

ক) মানবদেহে / জলস্বাস্থ্যে জল দূষণের প্রভাব ঃ

দূষিত জল থেকে টাইফয়েড জনডিস, আমাশয়, কলেরা, আন্ত্রিক, পেট খারাপ, টিবি হেপাটাইটিস, চর্মরোগ, আর্সেনিক দূষণ, ফ্লোরাইড দূষণ মারাত্মক আকারে ধারণ করতে পারে।

অ্যাসবেসটস জাতীয় রাসায়নিক পদার্থে দূষিত জল থেকে অ্যাসবেস্টসিস, ক্যানসার প্রভৃতি রোগ হতে পারে।

তামা, ক্লোরিন, পারদ, নিকেল, লোহা, সায়ানাইড মিশ্রিত জল থেকে চর্মরোগ ও পেটের রোগ দেখা দেয়।

জল শোধনের সময় ফ্লুরিনের অতিরিক্ত ব্যবহার জলকে দূষিত করে এবং দূষিত জল অ্যালার্জি কিউনিসটিভ অসুখ, প্যারালাইসিস হাড়ের বিকৃতি প্রভৃতি জটিল রোগের কারণ হতে পারে।

খ) মৃত্তিকায় জল দূষণের প্রভাব ঃ

দূষিত জলের সাহায্যে কৃষিকাজ হলে —

ব্যাকটেরিয়া ও মাটির মধ্যে বসবাসকারী জীবাণুর ক্ষতির ফলে মাটির উর্বরতা হ্রাস পায়।

দূষিত ভূ-গর্ভস্থ জল মাটিতে ক্ষারের পরিমান বৃদ্ধি করে। দূষিত জলে উদ্ভিদের শারীরবৃত্তির পরিবর্তন ঘটে। ফলে শস্যের গুণগত মান যেমন নষ্ট হয় তেমনি উৎপাদনও ব্যবহৃত হয়।

সামুদ্রিক পরিবেশের উপর দূষিত জলের প্রভাব ঃ

এরপর 5 পাতায়

সূর্যের বুকে

2 পাতার পর

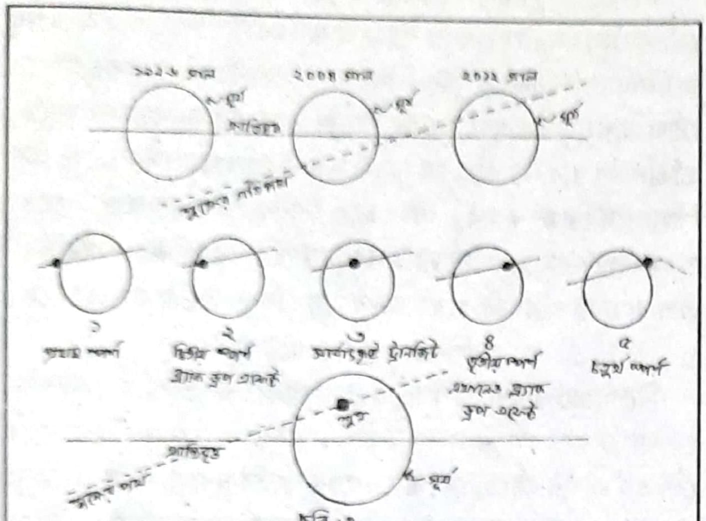

ছবি ৩

দেখা যাবে।

সময় ০৩:২৮:২৫ — সূর্যকে শুক্রের অন্যদিক স্পর্শ করবে। এটি দ্বিতীয় স্পর্শ (ছবি ৩ এর ২)। এখন শুক্র সম্পূর্ণভাবে সূর্যদেহে প্রবেশ করল। শুক্রকে একটি গোল চাকতির পরিবর্তে কালো কালির ফোঁটার মতো লম্বাটে দেখাবে। একে বলে 'ব্ল্যাক ড্রপ এফেক্ট'।

সময় ০৬:৩০:৫৮ — সূর্যের গোলাকার চাকতির প্রায় মাঝামাঝি অবস্থান করবে শুক্র। (ছবি ৩ এর ৩)

সময় ০৯ : ৩৪ : ০১ — সূর্য দেহ থেকে শুক্র বেরোবার সময় শুক্রের চাকতি সূর্যকে ভিতর দিক থেকে স্পর্শ করবে। এটি তৃতীয় স্পর্শ (ছবি ৩ এর ৪)।

সময় ০৯ : ৫১ : ২১ — সূর্য দেহের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে শুক্রের কালো চাকতি অদৃশ্য হয়ে যাবে। এটি চতুর্থ স্পর্শ। (ছবি ৩ এর ৫)।

বোঝাই যাচ্ছে আমরা দেখবো ট্রানজিটের সূর্যোদয়। এ এক অতি বিরল দৃশ্য।

শুক্রের ট্রানজিট খালি চোখে দেখা যাবে না। সূর্যের দিকে খালি চোখে সরাসরি তাকালে চোখের রেটিনা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। রোদ-চশমা, ভুসাকালি মাখানো কাচ কিংবা এক্স-রে প্লেট দিয়েও ট্রানজিট দেখা নিরাপদ হবে না। ফিল্টারহীন টেলিস্কোপ বা বায়নোকুলার দিয়ে ভুলেও ট্রানজিট দেখার চেষ্টা করবেন না। সূর্যকে সরাসরি দেখার জন্য ফিল্টার চশমা, ১৪ নম্বর ওয়েল্ডিং গ্লাস এবং ফিল্টার দেওয়া টেলিস্কোপ ব্যবহার করুন। পিন হোল ক্যামেরায় বা টেলিস্কোপে বিম্বিত সূর্যে শুক্রের ট্রানজিট দেখা সবচেয়ে ভালো। ফিল্টার চশমা দিয়ে ৮-১০ সেকেন্ড দেখে নিয়ে আবার কিছুটা পরে ৮-১০ সেকেন্ড দেখা ভালো।

আসুন সকলে মিলে শুক্রের ট্রানজিট দেখি। এই বিরল সুযোগ যেন হেলায় নষ্ট না হয়। এর পরের ট্রানজিট দেখতে হলে আমাদের প্রত্যেককেই বাঁচতে হবে আরো ১০৫ বছর।

— গোবিন্দ দাস, ৮৪২০০৪০৮৫২

জল সমস্যা ও ভবিষ্যৎ

4 পাতার পর

সমুদ্র জলে ভাসমান তেলের আস্তরণ সামুদ্রিক প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্ষতি করে এবং মাছের উৎপাদন কমে যায়। দূষিত জলের প্রভাবে জলজ উদ্ভিদে বিষাক্ত পদার্থ জমা হয়। যেমন-ন্যাপথলিন, ফেনানথ্রিন, বেঞ্জপাইরিন ইত্যাদি। জল দূষণের জন্য আঞ্চলিকভাবে সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র নষ্ট হয়। জল দূষণের ভয়ংকরতার হাত থেকে রক্ষা তো পেতেই হবে, করতে হবে জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ। তাই আমাদের খেয়াল রাখতে হবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর—

জল দূষণ নিয়ন্ত্রণ ঃ

নদী, খাল, বিল, পুকুর, হ্রদ, সমুদ্রের জলে সরাসরি আবর্জনা ফেলা বন্ধ করতে হবে। জলকে শোধন করে তবেই নদী, খালবিল, জলাশয়ে ফেলার বন্দোবস্ত করতে হবে। চাষাবাদের কাজে অতিরিক্ত সার ও কীটনাশকের প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে। আবর্জনা দিয়ে পুকুর বা জলাশয় ভরাট করতে হবে। জল সচেতনতার জন্য ব্যাপক প্রচার চালানো আশু প্রয়োজন। জলদূষণ সংক্রান্ত আইনগুলি মেনে চলতে বাধ্য করা এবং তা না মানলে কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা।

— তুহিন শুভ্র মন্ডল, সদস্য, সাউথ এশিয়ান ফোরাম ফর এনভায়রনমেন্ট, মোবাইলঃ ৯৭৩৩২২৮৯৬৬ / ৯৪৭৫৯৩১২৯০

দুধ - বিকল্পর খোঁজে

৪ পাতার পর

পদ্ধতি) দুধ গ্রহিতাদের সরবরাহর ব্যবস্থা করেছিলেন।

এই নারকেল দুধকে যদি উদ্ভিজ হিসাবে বিকল্প দুধ ভাবি এবং ঐরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করি তাহলে বাজারে দুধের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে। কারণ ডেয়ারি ফার্ম কোন কোন জায়গায় উৎপাদন ক্ষমতা হারিয়েছে।

এবারে যদি প্রাণী দুধের সঙ্গে উদ্ভিদ দুধের তুলনা দেখি তাহলে কিছুটা স্বচ্ছ ধারণা আমাদের আসবে।

বিভিন্ন প্রকার দুধে পুষ্টি উৎপাদন: (প্রতি ১০০ গ্রাম ওজনে)

দুধের সরবরাহ দেশে করতে গেলে বা দুধের চাহিদার সঙ্গে সরবরাহ ঠিক রাখতে গেলে দেশে আরও ডেয়ারি ফার্ম স্থাপন করতে হবে। যদি প্রতিটি থানায়, মহকুমায়, জেলায় ডেয়ারি ফার্ম স্থাপন করা হয় তাহলে দুধের উৎপাদন যেমন বাড়বে তেমনি সমস্ত বয়সের বেকাররা কিছু কাজ পাবে এবং টাটকা দুধ অধিবাসীগণ খেতে পারবে। এক্ষেত্রে ভেটোরিনারী দপ্তরও বহু কর্ম সংস্থান দিতে পারবে।

তাছাড়া গোবর গ্যাসপ্ল্যান্ট মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে রান্নার জ্বালানি উৎপাদন হবে এবং গ্যাসপ্ল্যান্ট ব্যবহৃত গোবর জৈবসার হবে।

নারকেলের দুধের ফ্যাট ইত্যাদি কমিয়ে 'টোন্ড', 'ডবল টোন্ড' গরুর দুধের পর্যায়ে নিয়ে গেলে নারকেল দুধও গরুর দুধের সমপর্যায় হবে। তাই রাষ্ট্রসংঘ ঘোষিত আর্ন্তজাতিক অরণ্য বছর ২০১১-এ অন্যান্য গাছের সঙ্গে নারকেল গাছ এর অরণ্য সৃষ্টি করা জরুরী।

এসব প্রকল্প কার্যকরী করতে গেলে ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প গড়ে তুলতে হবে ও এতে বহু কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

মহামান্য সরকার বাহাদুর তার খাদ্য দপ্তর, প্রাণী সম্পদ দপ্তর যদি এদিকে দৃষ্টি দেন তাহলে এই 'মা মাটি মানুষের' বাংলায় কর্মের নবসংযোজন হবে।

—কানন কুমার প্রামানিক, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর-৯৪৩৪৩৬৯৬৬১

পিঁপড়ের নানা কথা

1 পাতার পর

অথচ এর চেয়েও অনেক বেশি পিঁপড়ে সংখ্যা হওয়া সত্ত্বেও তারা সুস্থভাবে নিয়মানুবর্তিতা সঙ্গে সামাজিক জীবন যাপন করছে। তাই পিঁপড়েদের কাছে আমাদের এখনও অনেক কিছু শেখার আছে।

নানা প্রজাতির পিঁপড়ে

পৃথিবীতে পিঁপড়ে আছে কত রকমের? জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায় যে পৃথিবীতে প্রায় আট হাজার আটশ প্রজাতির পিঁপড়ে আছে। এদের মধ্যে একশ তিরিশ ধরণের পিঁপড়ে পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায়। এরা পৃথিবীতে এসেছে মানুষ পৃথিবীতে আসার অনেক আগে। ফসিলের বয়স প্রায় আট কোটি বছর। তাই বলা যায় সেই ক্রিটেসিয়াম যুগ থেকে এরা আছে। সেই সময়কার বহু প্রাণী এমনকী ডায়নোসারের মত অতিকায় এবং অতি বলবান জীবগুলোও পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে। অথচ এরা ক্ষুদে শরীর নিয়ে শুধু টিকেই আছে তা নয়, বিশাল পপুলেশন, বাসস্থান, খাদ্য, আইন শৃঙ্খলা প্রভৃতির সমস্যা সবই সুষ্ঠভাবে সামলে চলেছে।

পিঁপড়ের কামড়

পিঁপড়ে যখন কামড়ায় তখন ভীষণ জ্বালা করে। কেন জান? এরা কামড়ানোর জায়গায় ফরমিক অ্যাসিড ঢেলে দেয়। এই কারণে চুলকোতে চুলকোতে জায়গাটা ফুলে ওঠে। এই অ্যাসিড এদের শরীরেই উৎপন্ন হয়। ফরমিক অ্যাসিড তৈরি করতে পারে বলে এরা ফরমিসিডির পরিবারভুক্ত। এদের নিকট আত্মীয় বোলতা, মৌমাছি, ভীমরুল ইত্যাদি। বিশেষজ্ঞদের মতে পিঁপড়ের ক্রমবিকাশ বোলতা থেকে। পিঁপড়েদের মধ্যে ডেঁয়ো পিঁপড়েরা সাংঘাতিক। এরা একবার কামড়ে ধরলে ছাড়তে চায় না। টানা হেঁচড়া করলে সেখানটা কামড়ে ধরে থাকে সেখানকার মাংস ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে। অনেক সময় টানাটানিতে এদের দেহাংশ ছিঁড়ে যায় কিন্তু মুখ আলগা করানো যায় না। কোনও কোনও পিঁপড়ের পেছনে হুল থাকে। বিপদ বুঝলে এরা হুল ফুটিয়ে দেয়। নালসো পিঁপড়েরা বিভিন্ন ফলের গাছে পাতা দিয়ে বাসা বানিয়ে থাকে। এইসব গাছে ফল পাড়তে উঠলে আর দেখতে হবে না। এদের সম্মিলিত আক্রমণে তখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। এক ধরণের ক্ষুদে কালো পিঁপড়ে আছে যারা কামড়ায় না। তবে গায়ে উঠলে ভীষণ সুড়সুড়ি লাগে। তাই অনেক সময় একে সুড়সুড়ি পিঁপড়ে বলা হয়।

পিঁপড়েরা সামাজিক জীব

পিঁপড়েরা একা একা থাকতে ভালোবাসে না। এরা সব সময় দল বেঁধে থাকে। প্রতিটি দলে থাকে সাধারণত একটি রানি পিঁপড়ে কয়েকটি পুরুষ পিঁপড়ে এবং বাকি সব শ্রমিক পিঁপড়ে। শ্রমিক পিঁপড়েরা সকলেই বন্ধ্যা স্ত্রী পিঁপড়ে। তাই বলা যায় পিঁপড়ে সমাজে স্ত্রী পিঁপড়েদের সংখ্যাই বেশি এবং সমাজ পরিচালনার দায়িত্বেও থাকে এরাই। রানি পিঁপড়ে চেহারায় সব চেয়ে বড় হয়। পুরুষ পিঁপড়েরা তুলনায় ছোট হয়। শ্রমিক পিঁপড়েদের মধ্যে দুধরনের পিঁপড়ে থাকে- সৈনিক পিঁপড়ে, কর্মী পিঁপড়ে। সৈনিক পিঁপড়েরা পুরুষ পিঁপড়েদের থেকে কিছুটা বড় চেহারার হয়। আর সব থেকে ছোট হয় কর্মী পিঁপড়েরা। প্রতিটি বাসার দেখভাল আইন-কানুন প্রভৃতি সবই এই কর্মী পিঁপড়েদের দায়িত্বে থাকে।

পিঁপড়েরা খুব বেশি হলে মাস দুই বাঁচে। তবে পুরুষ পিঁপড়েরা বেশির ভাগ সময়ই মিলনের পর মারা যায়। রানী পিঁপড়েদের কাজ শুধু মাত্র ডিম পাড়া। রানি ও পুরুষ পিঁপড়েদের মিলনের আগে পাখনা গজাতে দেখা যায়। তখন এরা উড়তে পারে। তবে এর ব্যতিক্রমও আছে। প্রতিদিনের যাবতীয় কাজকর্ম সামলায় কর্মী পিঁপড়েরা। বাসা এবং অন্য পিঁপড়েদের রক্ষা করার দরকার হলে সৈনিক পিঁপড়েদের ডাক পড়ে। পতঙ্গ জগতের মধ্যে পিঁপড়েরাই সবচেয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। প্রতিদিনই এরা ঘরদোর পরিষ্কার করে। এদের অসুখ বিসুখ হয় না বললেই চলে।

পিঁপড়েরা কি দেখতে পায়?

বিশেষজ্ঞদের ধারণা পিঁপড়ের চোখ থাকলেও দৃষ্টিশক্তি এতই ক্ষীন যে এরা দেখতে পায় না বললেই চলে। তাহলে এরা বোঝে কিভাবে যে কোথায় খাবার আছে, কোথায় তাদের বাসার দরজা, বাসার ভিতরে কোথায় তাদের খাবার রাখার জায়গা, কোথায় তাদের বাচ্চারা আছে ইত্যাদি ইত্যাদি? ফেরোমোন নামে এক ধরণের রাসায়নিক পদার্থ এদের শরীরে তৈরি হয়। মাঝে মাঝেই এরা সামনের দুটি পা দিয়ে মুখ থেকে ফেরোমোন নিয়ে মাথার উপরের লম্বা শুঁড় দুটিতে মাখিয়ে নেয়। এই রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যেই এরা সব কিছু বুঝতে পারে এবং ভাবের আদান প্রদান করে। তাই এরা দিনে রাতে সব সময়েই কাজ করতে পারে।

পিঁপড়ের আয়ু

ডিম থেকে পূর্ণাঙ্গ পিঁপড়ে হতে প্রায় দু'সপ্তাহ সময় লেগে যায়। এরপর খুব বেশী হলে এরা দু'মাসের মত বাঁচে। পিঁপড়ের মত কিছু পিঁপড়ের আয়ু অবশ্য এক মাসের মত। গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলে পিঁপড়েদের বেশি দেখা গেলেও শুষ্ক অঞ্চল এরা পছন্দ করে না। কারণ এদের বেঁচে থাকার জন্য জলীয় বাষ্পের প্রয়োজন হয়। তাই গরম অথচ আর্দ্রভাব বেশি এমন জায়গাতেই এরা বাড়ি ঘর বানায়। বাসার ভিতরে যাতে যথেষ্ট আর্দ্রভাব থাকে সেদিকে খেয়াল রেখে এরা বাসা বানায়।

পিঁপড়ের শিকার ধরা

পিঁপড়েরা দেখতে ক্ষুদে। আঙুল দিয়ে টিপে দিলেই অক্কা। কিন্তু দল বেঁধে যখন আক্রমণ করে তখন মানুষের কাছেও এরা রীতিমত আতঙ্ক। এদের ভয় পায় না এমন প্রাণী পৃথিবীতে খুব কম আছে। মাকড়শা, আরশোলা, কেঁচো, কেন্নো ইত্যাদির মত বড় দেহের প্রাণীদের শিকার করার সময় এরা দল বেঁধে চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলে। তারপর প্রাণীটির দেহে বাঁকানো চোয়াল দিয়ে মারাত্মক কামড় বসায়। কামড়ে কামড়ে গা থেকে মাংস ছিঁড়ে নেয়। ফলে প্রাণীটি নিস্তেজ হয়ে পড়ে। তখন সকলে মিলে কামড়ে ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিজেদের বাসার দিকে নিয়ে যায়। এরপর শিকারের দেহটাকে টুকরো টুকরো করে বাসার ভিতরে নিয়ে গিয়ে যতটা খাওয়ার খেয়ে বাকী ভাড়ারে তুলে রাখে। পিঁপড়েরা দল বেঁধে কাজ করে বলে নিজেদের তুলনায় অনেক বড় প্রাণীদের ঘায়েল করতে কোনও অসুবিধা হয় না।

এরপর 7 পাতায়

পিঁপড়ের নানা কথা

6 পাতার পর

পিঁপড়েরা যখন শিকার ধরতে বা খাবারের খোঁজে বের হয় তখন সৈন্য সামন্ত নিয়ে বের হয়। শিকার বা খাবার নিয়ে এক দল পিঁপড়ে যখন সার বেঁধে বাসায় ফিরতে থাকে তখন সৈনিক পিঁপড়েরা এদের পাহারা দেবার জন্য চোঁয়াল উঁচু করে পাশে পাশে চলতে থাকে। এই সময় কেউ খাবার কেড়ে নিতে এলে তাকে আর দেখতে হবে না। ক্ষুদে ক্ষুদে সৈনিক পিঁপড়েগুলো হৈ হৈ করে ছুটে এসে শত্রুকে দফারফা করে ছাড়বে। তারপর মৃত শত্রুর দেহটা চলার পথের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার পথ চলতে শুরু করবে।

পিঁপড়ের বুদ্ধি

ছোট্ট দেহ। মাথাটা আরও ছোট্ট। কতটুকুই বা বুদ্ধি থাকতে পারে ঐটুকু মাথায়? কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী ক্ষুদে পিঁপড়ের ক্ষুদে মাথার বুদ্ধি দেখে অবাক হতে হয়। একটি বড়সড় কেঁচোকে ঘায়েল করার পর তাকে বাসার দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া সহজ কথা নয়। হাজার হাজার পিঁপড়ে মিলেও ওটাকে টানতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। তাই কেঁচোর দেহের ওজন কমানোর জন্য এরা শুকনো মাটির ঢেলা কেঁচোটির দেহে ছড়িয়ে দেয়। মাটির ঢেলা কেঁচোটির দেহের অতিরিক্ত জলীয় পদার্থ শুষে নিয়ে ওজন কমিয়ে দেয়। ফলে কেঁচোটিকে টেনে নিয়ে যেতে অনেক সুবিধা হয়।

পিঁপড়ে কি খায়?

পৃথিবীতে পিঁপড়ে এসেছে আট কোটি বছরেরও আগে। তখন মানুষ কোথায়? বরং বলা যায় সময়ের হিসেবে মানুষ ওদের কাছে শিশু অতএব ধরে নেওয়া যায় পৃথিবী তখন ছিল জলা জঙ্গলে ঠাসা। পিঁপড়ের দল ঘুরে বেড়াতো ওইসব জঙ্গলে, পাহাড়ের খাদে এবং জলাভূমির আশেপাশে। উদ্দেশ্য শিকার ধরা। ছোট বড় কীটপতঙ্গ ওদের লক্ষ্যবস্তু। শিকার আকারে বড় হলেও এই ক্ষুদে প্রাণীর সঙ্গে যুদ্ধে কিছুতেই এঁটে উঠতে পারে না। দল বেঁধে চারদিক ঘিরে ফেলে শিকারের দফারফা করে ছাড়ে। এইসব ছোট্ট ছোট্ট প্রাণীদের মাংস এদের প্রিয় খাদ্য। কোনও কোনও জাতের পিঁপড়ে ছোট ছোট গাছের বীজও খায়। এরা নিজেরা ছত্রাক চাষ করে সেই ছত্রাক খেয়ে থাকে।

মানুষ আসার পর পৃথিবীর পরিবেশ অনেকটাই পাল্টে যায়। বন-বাদাড় সাফসুফো হয়ে ইট বালি পাথরের বড়বড় ইমারৎ তৈরি হতে থাকে। পত্তন হয় বড় বড় শহরের। ক্রমশ জঙ্গল ছোট হতে থাকে। জলাভূমির আয়তন কমতে থাকে, শহরের সংখ্যা বাড়তে থাকে। পিঁপড়েরা পড়ল মহা সমস্যায়। বনে জঙ্গলে হা করে এত দিনের অভ্যাস পাল্টে শহরবাসী হবে কী ভাবে? মানুষও ভাবল এবার ব্যাটাদের জব্দ করা গেছে। বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোর সময় হাত-পা কামড়ে ফুলিয়ে দিত। উঃ সে যে কী সাংঘাতিক জ্বালা?

কয়েকদিন যেতে না যেতেই মানুষ বিস্ময়ে হতবাক। তাদের সমস্ত হিসেব নিকেশ ওলট পালট করে দিয়ে কাতারে কাতারে পিঁপড়ে শহরে ঢুকে পড়ল। নতুন পরিবেশে দিব্বি মানিয়ে নিয়ে বাড়ির আনাচে কানাচে দেওয়ালের ফাটলে ইত্যাদি নানা জায়গায় নিজেদের নতুন আস্তানা তৈরি করে নিল।

(এরপর আগামী সংখ্যায়) — *কমল বিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়*

চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিরল দিন

আসলে পৃথিবীতে যে বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে তার রূপকার প্রায় সবসময়ই খুব সাধারণ মানুষ। আর এইরকম এক যুগান্তকারী ঘটনায় নিজেকে উৎসর্গ করলেন বিমল কর্মকার।

বিমল কর্মকার কে? চেনেন কী? আসলে না চেনারই কথা। কোনো ঝাঁ চকচকে শহরের বাসিন্দা নয়। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার পায়রাডাঙ্গার প্রীতিনগর গ্রামের ৫ নম্বর রাস্তার বাসিন্দা। এলাকার মানুষই জানেন না বিমলবাবুর এই ঘটনা সম্পর্কে। অতি সজ্জন নির্বিবাদী মানুষ (বিমলবাবুর প্রতিবেশী সলিল চৌধুরীর কথায়) স্ত্রীর সাথে বিচ্ছেদ হওয়ার পর উনি একাই থাকতেন। খুব আলাপী, খাদ্যরসিক এবং মানুষের সাথে কথা বলতে ভালোবাসতেন। কাজ করতেন কলকাতার বেলভিউ নার্সিংহোমের সিকিউরিটি গার্ডের রাত ১০টার ট্রেন তারপর দিন সকালে পায়রাডাঙ্গার বাড়ি। ১২/২/২০১২ স্ট্রোক হয় বিমলবাবুর। বেলভিউ নার্সিংহোমের ডাক্তারবাবুরা খুব ভালোবাসতেন বিমলবাবুকে। চিকিৎসা শুরু হয় কিন্তু ভেন্টিলেশনে চলে যান বিমলবাবু। এরপর বিমলবাবুর ব্রেনডেথ (মস্তিষ্কের মৃত্যু) হয়। বিমলবাবুকে ভালোবাসতেন ডঃ সৌরভ কোলে (বেলভিউ ক্লিনিকের এ্যানাটমি বিভাগের ইনচার্জ) উনি বিমলবাবুর বোন ও জামাইবাবুকে খবর দেন এবং অনুরোধ করেন ওনার দেহদান করার জন্য। তাঁরা মতামত দেন। এরপর এস.এস. কে.এম. হাসপাতাল (যার ডাক নাম পি.জি. হাসপাতাল) থেকে ৪ জন এক্সপার্ট ডাক্তারবাবু আসেন বেলভিউ ক্লিনিকে এবং ভালো করে দেখে বলেন বিমলবাবুর ব্রেনডেথ হয়েছে। এরপর এস.এস.কে.এম. তাঁর দেহ গ্রহণ করে। তারপর শুরু হয় তাঁর শবব্যবচ্ছেদ।

ডঃ রঞ্জন পান্ডে এবং এস.এস.কে.এমের ডাক্তারবাবুগন ঐতিহাসিক কাজটি শুরু করেন। ১৭/২/২০১২ সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা ১৮/২/২০১২ দুইটি কিডনি তাঁর দেহ থেকে তোলেন এবং সাথে সাথেই পিন্টু মন্ডল, বয়স ১৯ এবং শংকর মন্ডল বয়স ৩৮ এদের দেহে প্রতিস্থাপন করেন। পিন্টুর বাবা একজন দিনমজুর আর শংকরের একটি ফার্নিচারের দোকান আছে।

বিমলবাবু পথ দেখালেন। পূর্ব ভারতে এই প্রথম মস্তিষ্কের মৃত্যুর পর দেহ থেকে কিডনী প্রতিস্থাপন একটি বিরল দৃষ্টান্ত আর ডাঃ সৌরভ কোলে (বেলভিউ নার্সিংহোমের ডাক্তারবাবু), সান্ত্বনা দত্ত, কৃষ্ণগোপাল দত্ত (বিমলবাবুর বোন এবং বোনের স্বামী) এবং ডাঃ রঞ্জন পান্ডে এবং সহযোগী ডাক্তারবাবুগনকে আমাদের সংগঠন 'চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা'র পক্ষ থেকে নমস্কার।

আর যাদের কথা না বললেই নয় তাঁরা হলেন গনদর্পনের সদস্যগন। যাঁরা গত ২১শে ফেব্রুয়ারি বিমলবাবুর পরিবার ও ডাক্তারবাবুদের সম্বর্ধিত করেছেন।

মানুষের মৃত্যুর পর করলে দেহ-চক্ষুদান
আমাদের কাছে শিক্ষণীয়, সমাজের কাছে তাঁরা মহান।

—বির্বতন ভট্টাচার্য, চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা।

দুধ – বিকল্পের খোঁজে

স্তন্যপায়ী প্রাণীর স্তনগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত তরল সাদা পদার্থ-ই হচ্ছে দুধ। শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলের জন্যই দুধ একটি আদর্শ খাদ্য। প্রকৃতির সমস্ত খাদ্যর মধ্যে দুধই উৎকৃষ্ট। এতে লৌহ ও তাম্র নেই। ভিটামিন সি অতি অল্প মাত্রায় থাকে। তথাপি প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ ইত্যাদি সবই সঠিক অনুপাতে দুধে থাকায় দৈহিক উন্নতি ও বিভিন্ন ক্ষয়ক্ষতি নিবারণের জন্য দুধ মানুষের কাছে অতি প্রিয়। বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা সর্বজনবিদিত।

শিশুদের প্রয়োজন মেটাতে মায়ের দুধই যথেষ্ট। তবে অন্যান্য সব প্রয়োজন মেটাতে গরু, মোষ, ছাগলের দুধের ওপর নির্ভর করতে হয়। অনেক সময় এই বিকল্প দুধ নানা প্রকার রোগ জীবানু আমাদের শরীরে বহন করে আনে। ফলে কখনও কখনও দুধ জনস্বাস্থ্য রক্ষা যেমন করে তেমনই রোগ আক্রমণও করে। টিবি, রক্ত আমাশয়, টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড, তড়কা, ব্রুসেলোসিস, সালমোনেলোসিস, গ্যাস্ট্রোএনটেরোটাইটিস প্রভৃতি রোগ দুধ-ই বহন করে আনে। নানা উৎস এর জন্য দায়ী। তবে দুধে জল মেশানো বহুদিন ধরে চলে আসছে। স্মরণ করলে পাওয়া যায় সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রসন্ন গোয়ালিনীর দুধ সহজেই চেনা যেতো দুধে জল দেখে। এই জল নানা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে মেশনো হয়। তাই দুধ রোগজীবাণু মিশ্রিত হতে পারে এবং যে প্রাণীটির দুধ পান করা হচ্ছে তার যেন সুস্থ শরীর হয় এবং যে পাত্রে দুধ রাখা হয় এবং যে পরিবেশে গরু থাকে তা যেন জীবাণুমুক্ত হয়।

এই জীবাণু ছাড়াও এইসব দুধে বর্তমান দিনে ইউরিয়া, নুন, সোডা, পামতেলের মতো জিনিস মেশানো হচ্ছে। প্রসঙ্গত সরকারী দুগ্ধ সংস্থার বাতিল করা হাজার হাজার লিটার দুধ প্রতিদিন বাজারে দেদার বিক্রি হচ্ছে।

এছাড়া দুধ যা বাজারে পাওয়া যায় তা পুরোপুরি কৃত্রিম। বড়ো বড়ো ডেয়ারি ফার্মে দুধ সংগৃহীত হয় যান্ত্রিক পদ্ধতিতে এবং পরে জীবাণুমুক্ত, প্যাস্টুরাইজড করা হয়। অতিরিক্ত ফ্যাট বের করে নেওয়া হয়, তারপর কিছু সংরক্ষণ উপযোগী রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে দুধের পরমায়ু অতিরিক্ত, পনেরো দিন বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এই দুধ-ই প্যাক করে বাজারে চালান দেওয়া হয়।

অতিরিক্ত মুনাফার লোভে দুধ দোয়ার আগে গরু বা মোষের শরীরে অনেক সময় হরমোন ইনজেকশন দিতে দেখা যায়। এই ইনজেকশন দেওয়ার পরে যে দুধ পাওয়া যায় তা মানুষের পক্ষে কতটা ক্ষতিকর সে ব্যাপারে কেউ সচেতন নয়, কী ক্রেতা কী বিক্রেতা।

দুধে জল মেশানো প্রাচীন সহজ পদ্ধতি। দুধের সঙ্গে জল যারা মেশায় তারা যদি চালাক হয় তাহলে গরুর জল মিশ্রিত দুধে তার আপেক্ষিক ঘনত্ব (সামান্য অ্যাসিড) যাতে বজায় থাকে সেজন্য বাতাসা ভাল করে গুঁড়ো করে মিশিয়ে দেয়। কারণ এতে ল্যাকটোমিটার ঘনত্ব মাপার যন্ত্র দিলেও বোঝার উপায় নেই জল মেশানো কিনা। আর দুধে এতে তলানিও পড়ে না।

দুধ অস্বচ্ছ তরল সাদা পদার্থ। এই তরল এ ফ্যাট কণা ভেসে বেড়ায় সমভাবে কিন্তু কখনও একত্রে জড়ো হয় না। কারণ প্রতিটি ফ্যাট কণার ওপর প্রোটিন আবরণ তৈরী করে বলে। তিন প্রকার প্রোটিন, ক্যাসিনোজেন, ল্যাক্টঅ্যালবুমিন, ল্যাক্টগ্লোবিউলিন দুধে পাওয়া যায়।

বাজারে যে দুধ পাওয়া যায় তা হচ্ছে 'হোল মিল্ক' (ফ্যাট 4.1%), 'টোন্ড' দুধ (ফ্যাট 0.3%), 'ডলব টোন্ড' দুধ (ফ্যাট 0.5%) এবং 'স্কীমন্ড' দুধ (ফ্যাট 0.1%)।

এছাড়া রয়েছে গুড়ো দুধ। যা পরিপাকে প্রচুর পরিমালে পাচক রসের প্রয়োজন। শিশুদের পক্ষে একে পরিপাকে প্রচুর পাচক রস নিঃসরণের জন্য পাকগ্রন্থি ক্রমশঃ দূর্বল হয়।

আমেরিকা থেকে যখন গুঁড়ো দুধ আসত তখন ঐ দুধ বাজার দখল করে নিয়েছিল। এবং ঐ দুধে খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখা যাওয়ায় ফিলিপাইন সরকার ঐ দুধ বন্ধ করে গরুর দুধের সঙ্গে নারকেলের দুধ মিশিয়ে (সঠিক

এরপর 5 পাতায়

বিভিন্ন প্রকার দুধে পুষ্টি-উপাদান ঃ (প্রতি ১০০ গ্রাম ওজনে)

খাদ্যের নাম	ক্যালরি	প্রোটিন	ফ্যাট	শর্করা	ক্যালশিয়াম	ফসফরাস	লোহা
					মিলিগ্রাম হিসাবে		
গরুর দুধ	৬৭	৩.২	৪.১	৪.৪	১২০	৯০	০.২
মহিষের দুধ	১১৭	৪.৩	৮.৮	৫.১	২১০	১৩০	০.২
ছাগলের দুধ	৭২	৩.৩	৪.৫	৪.৬	১৭০	১২০	০.৩
মানুষের দুধ	৬৫	১.১	৩.৪	৭.৪	২৮	১১	০.১
গুঁড়ো দুধ	৪৯৬	২৫.৮	২৬.৭	৩৮.০	৯৫০	৭৩০	০.৬
নারকেলের দুধ	৪১৮	২.৪	৪১৩	৯.১	২০	১৬০	১.৪

যোগাযোগ—বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর), পোঃ কাঁচরাপাড়া ৭৪৩১৪৫, উঃ ২৪ পঃ। ফোন ঃ ০৩৩-২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩৩০০৯২।
সম্পাদক মন্ডলী—অভিজিৎ অধিকারী, বিবর্তন ভট্টাচার্য, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, তাপস মজুমদার, চন্দন সুরভি দাস, চন্দন রায়, কিঞ্জল বিশ্বাস।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।
অক্ষর বিন্যাস ঃ রিম্পা কম্পিউ, কাঁচরাপাড়া হাইস্কুল মোড়, কাঁচরাপাড়া, চলভাষ ঃ ৯৮৩৬২৭১২৫৩
সম্পাদক—শিবপ্রসাদ সরদার। ফোন ঃ ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০) E.mail-ganabijnan@yahoo.co.in